আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন

শরৎকালীন সংখ্যা

ভাদ্র ১৪৩০

হিসেব মতো বরষণের কাল শেষ হতে এল। শুরু হল শরৎ কাল। মা আসবেন আর কয়েকদিন বাদেই। শুরু হয়ে গেছে সাজো সাজো রব। আস্তে আস্তে সরে যাবে কালো মেঘের দল। আমাদের মনের আয়নায় এখনো বাদল বাতাসের ওড়াউড়িতে ভেসে আসা পাতা আর খড়কুটোর ভিড়। পরিষ্কার হোক চরাচর । মানুষ ভালো থাকুক।

সম্পাদকীয়

আশিস পণ্ডিত

দেখতে দেখতে শ্রাবণের দিনগুলো পেরিয়ে এসে পড়ল ভাদ্র মাস। শরত কাল। উৎসবের ঋতু। বর্ষার অঝোর বর্ষণ হয়ত আরো কিছুকাল আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না , কিন্তু সেই কৃষ্ণকালো মেঘমালার ফাঁকে ফাঁকে এর মধ্যেই উঁকি দিয়ে যাচ্ছে শরতের সোনা আলোর ঝলক। মনে পড়িয়ে দিচ্ছে এসে গেল উৎসবের কাল।

এর মধ্যেই অবশ্য ভারতের নানা রাজ্যে দখলদারি শুরু হয়ে গেছে সন্ত্রাসের। কাশ্মীর তো ছিলই, তার সঙ্গে কয়েক মাস হল জুড়ে গিয়েছিল মণিপুর , এবার সেই সঙ্গে জুড়েছে হরিয়ানার গুরগাঁও। সর্বত্র কেবল হত্যালীলা আর ধ্বংসের আবহ। দেশজুড়ে যত প্রতিবাদই উঠুক না কেন তাকে থোড়াই কেয়ার করে রক্তের ধারা আর আগুনের লেলিহান শিখা তাদের থাবা শানিয়ে নিচ্ছে রাজ্যের নিরীহ মানুষগুলোর ওপর। প্রতিদিন ধ্বংসলীলা তার রক্তমাখা ধারালো নখ নামিয়ে আনছে আমাদের সহ নাগরিকদের শরীরে।অসহায় শিশু আর নারীদের আর্ত কাতর সাহায্যের আবেদন জ্বালিয়ে দিচ্ছে আমাদের কানের পর্দা । আশা করা যাক রাষ্ট্র নিশ্চয় তার বাসিন্দাদের এই আর্তিতে সুরক্ষার হাত।হিংসার করাল থাবা আর সকাল হতে না হতেই খবরের কাগজের বুক থেকে লাফিয়ে নামবে না আমাদের চোখের তথা মনের চামড়ায়।

যত উৎসবের ঋতুই আসুক, তা যেন ভরে না ওঠে আর্তের কান্নায় । তা যদি ওঠে তাহলে আমাদের সমস্ত শান্তি কামনাই বৃথা । শতাব্দী লালিত এই আর্তের কান্না বন্ধ হোক --- এই হোক আজকের সার্বিক আবেদন।

সূচিপত্র

মণিপুর: এই অবস্থার অবসানের জন্য ব্যবস্থা নেবার দায় কার? **Page 5**
অশোক দে

সতী, অভিজিৎ ও নক্ষত্রচক্র (প্রথম ভাগ) **Page 7**
আদিত্য ঠাকুর

ইলিশ কথা !! **Page 11**
বাবলু দে

চলে গেলেন ডেরেক ম্যালকম **Page 15**
চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

অজানার উজানে (প্রথম ভাগ) **Page 16**
বাবলু সাহা

সুমেরুতে সাতদিন (তৃতীয় ভাগ) **Page 19**
রাজর্ষি পাল

বাঙালির অ্যালেন **Page 25**
কিঞ্জল রায়চৌধুরী

চায়ে সারান রোগব্যাধি **Page 28**
অনীশ রায়

টা টা করুন হজমের সমস্যাকে **Page 30**
আকাশ দাশগুপ্ত

ম্যাজিকের মতো সারান সাইনোসাইটিস **Page 32**
অলীক দাশ

বিরাট রহস্য জলের তলায় **Page 34**
অর্ণব দে

হাতের মুঠোয় বিদেশে ডাক্তারি পড়তে যাবার সুযোগ **Page 36**
সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

হাতের মুঠোয় কানাডায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ **Page 38**
শোভেন রায়

সবুজ-মেরুন আবেগের নাম মোহনবাগান **Page 39**
অলোক দাশ

লেখা ১

মণিপুর: এই অবস্থার অবসানের জন্য ব্যবস্থা নেবার দায় কার?

অশোক দে

আচ্ছা ধরুন এই ভারতেই কোনো রাজ্যে পপি বা আফিম চাষকে ঘিরে একটি সমান্তরাল অর্থনীতি চলছে। চলছে কেবল নয় গোটা রাজ্যের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের পরিমাণ যদি ধরা যাক হয় ৪৫ হাজার কোটি টাকার মতো, আর এই সমান্তরাল অর্থনীতির পরিমাণ হয় ৫০ হাজার কোটি টাকারও ওপর ?

মণিপুরের সংখ্যাগুরু মেইতেইদের যৌথ মঞ্চ কোকোমির দাবি মানলে এই হল আজকের মণিপুরের হাল। কেবল কি তাই , সুপ্রিম কোর্টে জমা পড়া এক নথিতে মণিপুর ট্রাইবাল ফোরামের দাবি এক বড় মাদক মাফিয়া নাকি মণিপুরের আগের মুখ্যমন্ত্রীর আত্মীয় , আর একজন নাকি আত্মীয় বর্তমান মুখ্যমন্ত্রীর। কেন্দ্রের গোয়েন্দা বাহিনীর কর্তাদের মতে আজ মণিপুরে যা চলছে তার পিছনে হাত আছে এই মাদক মাফিয়াদের। কেবল তাই নয়, এই মাদক পাচারের পথেই আমদানি হচ্ছে জঙ্গিদের অস্ত্রও। অর্থাৎ ড্রাগ মাফিয়াদের কুক্ষিগত এখানকার পুরো না হলেও রাজনৈতিক চিত্রটা, যাকে খুব ভেবেচিন্তেই রূপ দেওয়া হয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ মেইতেই আর সংখ্যালঘু কুকিদের মধ্যে জাতিতে জাতিতে ধর্মে ধর্মে সংঘর্ষে । কারণ, গোয়েন্দাদের মতে, এই মাদকের চাষ হয় কুকি এলাকায় , তা থেকে মাদক তৈরি হয় মেইতেই এলাকায় আর তা পাচার হয় কুকিদের মারফৎ ।

জাতিতে জাতিতে, ধর্মে-ধর্মে দ্বন্দ্ব মণিপুরে নতুন নয়। এর আগে মেইতেই-মুসলমান, মেইতেই-নাগা, নাগা-কুকি, অথবা মেইতেই-কুকি সংঘর্ষের নজির রয়েছে। কিন্তু পরিস্থিতি এতটা খারাপ হয়নি। এ বারে তিন মাস কেটে গেলেও অশান্তি প্রশমনের লক্ষণ নেই। এই এত রকম জাতিসত্তার দাবি ও আন্দোলনের গোলকধাঁধায় কী ভাবে সমাধানসূত্র মিলবে ? শিবিরে শিবিরে সকলের মোবাইল ফোনে জাতিহিংসার অগুনতি ভিডিয়ো। এখনও পর্যন্ত সেগুলো ছোট ছোট এলাকায় ব্লু-টুথের মাধ্যমে এর ফোন থেকে তার ফোনে পাড়ি দিচ্ছে। এক সঙ্গে সে সব ভিডিয়ো দেখে ঘৃণার আগুনে ঘি পড়ছে, কিন্তু সেটা স্থানীয় স্তরেই সীমাবদ্ধ। ইন্টারনেট চালু হলে ? ২০০৯ সালে জঙ্গি আন্দোলনের সময়েও মণিপুরে কর্মরত ছিলেন, এমন এক সিআরপিএফ জওয়ানের মতে, সেই সময় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা অনেক সহজ ছিল। ওটা ছিল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ, আর এ বারে জাতিতে জাতিতে লড়াই। নিজেদের মধ্যেই লড়াই। তাই নিরাপত্তা বাহিনী এ বার অনেক বেশি অসহায়।

আরও অসহায় সব মুখ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে এই শিবির থেকে ওই শিবিরে। অনেকে দল বেঁধে পালিয়ে এসেছেন। অনেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছেন। মাইলের পর মাইল হেঁটে, ঝোপের আড়াল খুঁজে খুঁজে কখনও বা কোনও মুসলমান পরিবারের আশ্রয়ে লুকিয়ে থেকে ক্যাম্পে এসে পৌঁছেছেন প্রাণ হাতে করে। সেই গল্প বলতে বলতে খানিকটা ভাবলেশহীনই হয়ে পড়ছিলেন অনেকে। সকলেই বাড়ি ফিরতে চান। কিন্তু ফিরতে পারলেও তো আবার সেই সব প্রতিবেশীদের সঙ্গেই থাকতে হবে, যাঁরা তাঁদের ঘরছাড়া করেছিলেন ! দু' পক্ষের ক্যাম্পের বাসিন্দাদেরই দাবি, সরকারকে নিরাপত্তা দিতে হবে। কিন্তু ভাঙা বিশ্বাস কি আর জোড়া লাগবে ? পারস্পরিক অবিশ্বাস এতটাই গভীরে যে তাকে উৎখাত করা আদৌ সম্ভব কি না জানা নেই।

লেখা ২

সতী, অভিজিৎ ও নক্ষত্রচক্র (প্রথম ভাগ)

আদিত্য ঠাকুর

আমরা আজ যা বিজ্ঞান বলে মানি তার ভাষা যেমন অঙ্ক এবং পরীক্ষার দ্বারা যাচাই ছাড়া কোন তত্ত্বকে যেমন গ্রহণ করি না, প্রাচীন কালে সেই অর্থে বিজ্ঞান প্রকাশিত হয় নি। জ্ঞানী মানুষ যাঁদের ঋষি বলে অভিহিত করা হত তাঁরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনেক সময়ই জটিলতার কারণে রূপকাকারে গল্প কাহিনীর মাধ্যেমে ব্যক্ত করতেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সত্যটি পৌঁছে দেওয়া সাধারণ মানুষের কাছে। অনেক পৌরাণিক আখ্যান আর লৌকিক উৎসবের দিকে ফিরে তাকালে ঘটনার উৎসমূলে আমরা প্রাকৃতিক জ্ঞান ও জ্যোতির্বিজ্ঞানকে খুঁজে পাব। এই নিয়ে শুরু হল নতুন ধারাবাহিক···

উপনিষদ ও পুরাণে যে সমস্ত উপাখ্যানের সন্ধান মেলে তা অনুধাবন করলে বোঝা যায় যে, তা কোন উদ্দেশ্য নিয়েই রচিত হয়েছিল। সামাজিক রীতি নীতি থেকে জীবন শৈলী সবই ছিল সেই সমস্ত কাহিনীর অঙ্গ। বৈদিক যুগে যখন সভ্যতার উন্মেষ হচ্ছে তখন যাঁদের আমরা মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি বলি তাঁরা তাঁদের রচনার মাধ্যমে সামাজিক বার্তা এবং শিক্ষা প্রদান করতেন। আমরা আজ যা বিজ্ঞান বলে মানি তার ভাষা যেমন অঙ্ক এবং পরীক্ষার দ্বারা যাচাই ছাড়া কোন তত্ত্বকে যেমন গ্রহণ করি না, প্রাচীন কালে সেই অর্থে বিজ্ঞান প্রকাশিত হয় নি। জ্ঞানী মানুষ যাঁদের ঋষি বলে অভিহিত করা হত তাঁরা তাঁদের পর্যবেক্ষণ অনেক সময়ই জটিলতার কারণে রূপকাকারে গল্প কাহিনীর মাধ্যেমে ব্যক্ত করতেন। তাঁদের মূল উদ্দেশ্য ছিল সত্যটি পৌঁছে দেওয়া সাধারণ মানুষের কাছে। অনেক পৌরাণিক আখ্যান আর লৌকিক উৎসবের দিকে ফিরে তাকালে ঘটনার উৎসমূলে আমরা প্রাকৃতিক জ্ঞান

ও জ্যোতির্বিজ্ঞানকে খুঁজে পাব।এই প্রবন্ধে তেমনই এক পৌরাণিক উপাখ্যান এবং তার তাৎপর্য নিয়ে আলোচনা করব।

দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ এবং রুদ্র অর্থাৎ মহাদেব দ্বারা সেই যজ্ঞ পণ্ডের কথা আমরা অনেকেই পড়েছি বা জানি। যাঁরা সেই কাহিনি পড়েননি তাঁদের জন্য সংক্ষেপে দক্ষযজ্ঞের গল্পটি বলছি। ব্রহ্মার অনেক মানসপুত্রের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন দক্ষ। ব্রহ্মা দক্ষকে প্রজাপালনের দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই প্রজারা ছিলেন প্রধানত স্বর্গীয় দেবতা, ঋষি ও আকাশের জ্যোতিষ্ক। এইজন্য দক্ষ ছিলেন প্রজাপতি। শ্রীমদ্ভাগবত অনুসারে দক্ষ মনুর কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। প্রসূতির গর্ভে ষোলটি কন্যার জন্ম হয়। এই কন্যাদের মধ্যে তেরোটি ধর্মকে, একটি অগ্নিকে, একটি মিলিত পিতৃগণকে এবং অবশিষ্ট কন্যা সতীকে মহাদেবের হাতে সম্প্রদান করেন। মহাভারত মতে দক্ষের পঞ্চাশটি কন্যা ছিলেন। এই কন্যাদের মধ্যে ধর্মকে দশটি, কশ্যপকে তেরোটি এবং চন্দ্রকে সাতাশটি কন্যা সম্প্রদান করেন। চন্দ্রকে সম্প্রদান করা দক্ষের সাতাশটি কন্যাই আকাশের নক্ষত্রচক্রের (Zodiacal Belt) সাতাশটি নক্ষত্র।

দক্ষ বৃহস্পতি নামে মহাযজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন, সেখানে স্বর্গলোকের সমস্ত দেবতা, বিশ্বের সমস্ত ঋষি, প্রাণীকুলের সমস্ত প্রাণী যজ্ঞে আমন্ত্রিত ছিলেন।

[কালিকা পুরাণ ১৬শ অধ্যায়ের কিছু অংশের উল্লেখ করা যাক]

‘সু-মহাত্মা-দক্ষ, সেই যজ্ঞে বরণ করেন নি ;—এমন কেউ ছিল না। ২২
দেবতা, দেবর্ষি, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, উদ্ভিদ, তৃণ, সিদ্ধ, সাধ্য, বিদ্যাধর, গন্ধর্ব্ব, যক্ষ, নাগ, আদিত্য, ঋষি, স্থাবরমণ্ডল-দক্ষ, সেই মহাযজ্ঞে সকলকে বরণ করেন। ২৩-২৪
কল্প, মন্বন্তর, যুগ, বর্ষ, মাস, দিবা, রাত্রি, কলা, কাষ্ঠা, ও নিমেষাদি সকলেই দক্ষকর্তৃক বৃত হয়ে সেই স্থানে সমাগত হন। ২৫
মহর্ষি, রাজর্ষি, দেবর্ষি, পুত্রামাত্যসৈন্য সমভিব্যাহারে, নৃপতি এবং বসু প্রমুখ গণ-দেবতা-সকলেই দক্ষকর্তৃক বৃত হয়ে যজ্ঞে গমন করেন। ২৬।
কীট, পতঙ্গ, জলজ প্রাণী, বানর, ঘোরবিঘ্নকর, শ্বাপদ, মেঘ, পর্বত, নদী, সমুদ্র, সরোবর ও দীর্ঘিকা-সকলেই বৃত হয়ে সেই স্থানে গমন করেন। ২৭

পাতালবাসী অসুর এবং দেবতুল্য সমস্ত রমণীগণও সেখানে গমন করলেন। তাঁরা সকলেই সেই যাযজুক দক্ষের যজ্ঞে স্ব স্ব হবির্ভাগ গ্রহণ করার জন্য সেখানে গমন করেন। ২৮
মহাত্মা দক্ষ, "মহাদেব কপালী, অতএব তিনি যজ্ঞার্হ নহেন" বিবেচনা করে সেই যজ্ঞে তাঁকে(মহাদেবকে) বরণ করেন নি। ৩০
সতী নিজের প্রিয়তনয়া হলেও, কপালীর ভার্যা বলে তিনি যজ্ঞে দোষদর্শী। দক্ষ, তাঁকেও যজ্ঞে আহ্বান করেন নি। ৩১'

সতী যজ্ঞের কথা শুনে বিনা নিমন্ত্রণেই পিতৃগৃহে যাবার জন্য মহাদেবের অনুমতি প্রার্থনা করেন। মহাদেব অনুমতি না দিলেও, সতী মহাদেবের কথা উপেক্ষা করে পিত্রালয়ে উপস্থিত হন। সতীর সামনেই দক্ষ মহাদেবের নিন্দা করতে শুরু করেন। স্বামী নিন্দায় অপমানিত হয়ে সতী যজ্ঞস্থলেই প্রাণত্যাগ করেন। মহাদেব সতীর প্রাণত্যাগের কথা শুনে ক্রোধে নিজের জটা ছিন্ন করে মাটিতে নিক্ষেপ করায়, জটা থেকে ভয়ানক বীরভদ্র উৎপন্ন হন। বীরভদ্র মহাদেবের অন্যান্য অনুচরদের নিয়ে যজ্ঞ ধ্বংস করেন। বিভিন্ন দেবতা এবং ঋষিদের ভয়ানক প্রহার ও অত্যাচার করেন এবং অনেককে হত্যাও করেন। পরে দক্ষের মাথা কেটে মাথা অগ্নিতে নিক্ষেপ করা হয় এবং দক্ষের মাথা ভস্মীভূত হয়।

"মহাদেব অত্যন্ত ক্রোধে সমুদায় দেবতাদের তাড়িয়ে দিয়ে মৃগরূপে পলায়ন-পর যজ্ঞের অনুসরণ করতে লাগলেন। ৫০ – কালিকা পুরাণ ১৬শ অধ্যায়
যজ্ঞ, আকাশ পথে ব্রহ্মলোকে প্রবিষ্ট হলেন; ক্রুদ্ধ বৃষধ্বজও সেই স্থানে প্রবেশ করলেন। ৫১ – কা. পু. ঐ
রুদ্র-ভীত যজ্ঞ, ব্রহ্মলোক হতে অবতরণ করে নিজ মায়াবলে সতী শরীরে প্রবিষ্ট হলেন। ৫২ – ঐ
তখন যজ্ঞানুগামী রুদ্র, মৃত সতীর কাছে গিয়ে তাঁর মৃত-শরীর দেখতে পেলেন। ৫৩ – ঐ
তখন, মহাদেব, দক্ষ-দুহিতা মৃত সতীকে দেখে যজ্ঞের কথা ভুলে গেলেন; শবদেহের পাশে বসে সতীর জন্য অত্যন্ত শোক করতে লাগলেন। ৫৪। – ঐ'

মৃত সতীকে দেখে বিহ্বল হয়ে মহাদেব তাঁর দেহ কাঁধে নিয়ে পূর্ব অভিমুখে যাত্রা করেন। প্রলয়ের আশংকায় সতীর দেহের মধ্যে ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শনি প্রবেশ করেন এবং সতীর মৃতদেহ খণ্ডে খণ্ডে কেটে ফেলেন এবং সেই খণ্ডাংশ বিভিন্ন স্থানে পতিত

হয়। আর এগুলোই পরবর্তী কালে বিভিন্ন মহাপীঠ নামে পরিচিতি পায়। সতী-শরীরের অন্য অবয়বসকল দেবগণকর্তৃক তিল তিল খণ্ডিত হয়ে বায়ুবেগে আকাশগঙ্গাতে গমন করল। মহাদেব শান্ত হলে ব্রহ্মা ও অন্যান্য দেবতা শিবকে তুষ্ট করে দক্ষের পুনর্জীবন প্রার্থনা করেন। দক্ষের মাথা ভস্ম হওয়ার কারণে একটি ছাগল বা অজের-মাথা দক্ষের মাথার স্থলে প্রতিস্থাপন করা হয়েছিল এবং দক্ষের প্রাণদান করা হয়। অন্যান্য যাঁদের শরীর বিকৃত হয়েছিল এবং যাঁরা নিহত হয়েছিলেন তাঁরাও পূর্বের শরীর ও প্রাণ ফিরে পেলেন। প্রাণ ফিরে পেয়ে দক্ষ মহাদেবের স্তুতি ও অর্চনা করেন এবং নতুন করে যজ্ঞ সুসম্পন্ন করেন।

দক্ষযজ্ঞ উপাখ্যানের অতি সংক্ষিপ্ত অংশ এখানে বর্ণিত হল।

দক্ষের পুনর্জীবন লাভে এবং অন্যান্য ঋষি এবং দেবতারা তাঁদের পূর্ববৎ শরীর ফিরে পেয়েছিলেন। পুরাণ বলছে ত্রিনাথ অর্থাৎ ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর জানতেন কী হতে চলেছে অথচ তাঁরা তা রোধ করার থেকে বিরত থেকেছেন, যেন তাঁরা চাইছিলেন সতীর মৃত্যু হোক। যাঁরা পুনর্জীবন দান করতে সক্ষম সেই ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর দক্ষ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত থাকলেও তাঁরা কেউই সতীর পুনর্জীবনের কথা ভাবেননি বা সচেষ্ট হননি সতীকে পুনরায় জীবন দান করতে। কিন্তু কেন এই প্রহেলিকার প্রয়োজন পড়েছিল ? তার উত্তর পুরাণ দেবার চেষ্টা করেনি। কারণ এমন একটি অবধারিত নৈসর্গিক জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক ঘটনা ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় ৫০০০ হাজার বছর আগে যা পরিবর্তন করার সাধ্য ছিল না কারুর। কেন এমন হয়েছিল, কী ছিল সেই ঘটনা, তার উত্তর আমরা খুঁজব পরবর্তী পরিচ্ছেদগুলোতে।

দ্বিতীয় ভাগ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

ইলিশ কথা !!

বাবলু দে

'ইলিশ ধরতে গেলে পড়তে হয় জলের মন' – এ কথা জানেন পোড় খাওয়া মাছ শিকারিরা। ইলিশের ঝাঁক জলে থাকলে ভেসে আসে এক বিশেষ আঁশটে গন্ধ। বাচ্চার জন্ম দিতে তারা সমুদ্র থেকে আসে মিষ্টি জলের নদীতে।

সত্তর বছর বয়সি এক মৎস্যজীবী দাঁড়িয়ে ছিলেন রূপনারায়ণের সামনে। জল মাপছিলেন চোখের আন্দাজে। এই ভাবেই জল মেপে তিনি বুঝতে পারেন নদী ভিতরে ভিতরে তৈরি হচ্ছে ইলিশের জন্য। মধু গুলগুলি বৃষ্টি নামল। ইলশেগুঁড়ি বৃষ্টিরই একটা রকমফের।

'ইলিশ ধরতে গেলে জলের মন বুঝতে হয়, জলের গায়ের গন্ধ নিতে হয়।' ইলিশ একা একা থাকতে পারে না। সপরিবার বেঁধে বেঁধে থাকে। ছোট বড় সকলেই। একে বলে 'গন্ধঝাঁক' । ইলিশরা এক সঙ্গে থাকলেই জলের উপর দিয়ে একটা আলাদা আঁশটে গন্ধ ভেসে আসে। তখনই বোঝা যায় ইলিশের ঝাঁক আছে নদীর বুকে।

আর জলের মন পড়তে গেলে চিনতে হয় জলের রং। তার আবার নানা নাম। ডাব জল, গাব জল, মাছ ধোয়া জল, চখা জল, কালো জল, চেরটা জল। চখা জল

চোখের জলের মতো পরিষ্কার। আর চেরটা জলে থাকে অনেক শেওলা। সব জলেই কিছু না কিছু ইলিশ থাকেই। তবে ঘোলা জলে ইলিশ পাওয়ার সম্ভাবনা বেশি।

'মাইগ্রের' একটা ল্যাটিন শব্দ। যার মানে ভ্রমণ। ইলিশ মাছ ভ্রমণপ্রিয়, তাই একে বলে মাইগ্রেটরি ফিশ। কিছু দিন সাগরে, তো কিছু দিন নদীতে। নোনা জলের দেশে থাকে ইলিশ। ওটা তার শ্বশুরবাড়ি। সন্তানের জন্ম দিতে ইলিশকে বাপের বাড়ি আসতে হয়। মিষ্টি জলের নদী ইলিশের বাপের বাড়ি। ইলিশের মা হল গঙ্গা আর মাসি পদ্মা। বছরে দু' বার বর্ষা আর শীতে ডিম ফুটিয়ে সন্তানের জন্ম দিতে ইলিশকে আসতে হয় মা মাসির কাছে।

ঝাঁক বেঁধে সমুদ্র থেকে যখন ওরা ঢোকে নদীর বুকে, তখন তাকেই বলে অ্যানাড্রোমাস পরিযাণ। গঙ্গা ভাগীরথী হুগলি রূপনারায়ণ ব্রহ্মপুত্র গোদাবরী নর্মদা তাপ্তী পদ্মা যমুনা মেঘনা কর্ণফুলি ইরাবতী সবেতেই সাগর উজিয়ে ইলিশ আসে।

গঙ্গা, পদ্মা উজিয়ে যে ইলিশ আসে, তাকে ইলিশ বললেও অন্য নদীতে ইলিশ পাওয়া গেলে, তার আর ইলিশ নাম থাকে না। সৈয়দ মুজতবা আলী 'পঞ্চতন্ত্র' এ লিখছেন, নর্মদা উজিয়ে যে ইলিশ আসে, ভৃগুকচ্ছের মানুষের কাছে তা 'মদার' । পার্সিদের কাছে তার নাম 'বিম' । সিন্ধু নদ উজিয়ে এলে ওই মাছের নাম 'পাল্লা' । তামিলরা ইলিশকে বলে 'উলম' । গুজরাতিরা পুরুষ ইলিশকে বলে 'পালভো' , স্ত্রী ইলিশকে বলে 'মোদেন' । তা ছাড়াও ইলিশের অনেক নাম: খয়রা ইলিশ, গৌরী ইলিশ, চন্দনা ইলিশ, গুর্তা ইলিশ, সকড়ি ইলিশ, জাটকা ইলিশ, ফ্যাসা ইলিশ, খ্যাপতা ইলিশ, মুখপোড়া ইলিশ এমন নানা রকম। বাংলাদেশে যে ইলিশ বিলে পাওয়া যায়, তাকে লোকে বলে 'বিলিশ' ।

অন্য মাছের তুলনায় ইলিশের কৌলীন্য বেশি। সাহিত্যিক শঙ্করের কথায় মৎস্য সমাজে ইলিশ একমাত্র উপবীত ধারী। তার দুপিঠে যে দুটো সুতো থাকে, তার নাম পৈতা।

আজ থেকে প্রায় ন' শো বছর আগে জীমূতবাহন তাঁর 'কালবিবেক' গ্রন্থে এই বিখ্যাত মাছটির নাম দিয়েছিলেন ইলিশ। আর ১৮২২ সালে মৎস্যবিজ্ঞানী হ্যামিলটন সাহেব এই মাছটির বিজ্ঞানসম্মত নাম দিলেন, হিলসা হিলসা। ১৯৫৫ সালে এই মাছের বিজ্ঞানসম্মত নামটি পাল্টে হল টেনুয়ালোসা হিলসা। এই 'টেনুয়ালোসা' শব্দটি

ইলিশেরই উপযুক্ত। শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ ‘টেনিয়াস’ থেকে, যার অর্থ পাতলা। ঝরঝরে চকচকে পাতলা শরীরের সুন্দরীর এমন নাম বেশ মানানসই।

যা সুন্দর তাতে কাঁটা থাকে। যেমন গোলাপ। ইলিশ সুন্দরীর ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। তার পেটের কাছের কাঁটা দেখে প্রজাতি ঠিক করা হয়। এই কাঁটাগুলো দেখতে ইংরেজি ‘ভি’ –অক্ষরের মতো। যাকে ‘স্কুট’ বলা হয়। এই স্কুটের সংখ্যা অনুযায়ী ইলিশের প্রজাতি পাঁচ রকম।

ইলিশের আবার বহুরূপী আছে। ইলিশ সুন্দরীর মতো দেখতে হলেও স্বাদে গন্ধে তারা কিন্তু ইলিশ নয়। যেমন, চাপিলা মাছ এবং কই–পুঁটি।

সমুদ্রে থাকার সময় ইলিশের শরীর ছোট, পাতলা আর কম স্বাদের হয়। নোনা জলের সংসার থেকে মিষ্টি জলের ঢোকার সময় থেকে ইলিশ পুষ্ট হতে থাকে। তার স্বাদ বাড়তে থাকে। আর লকডাউন ইলিশকে আরও একটু বেশি স্বাদ দিয়েছিল।

ইলিশ যে সব খাবার খেয়ে বাঁচে, তারা হল নীল–সবুজ শেওলা, কোপেপড, ক্লাদকেরা, রেটিফারের মতো জলে মিশে থাকা খাবার। নদীর জল ভাল হওয়ায় নদীর জলে মিশে থাকা খাবারও উন্নত হয়েছে। ভাল মানের খাবার খেয়ে ইলিশের স্বাদ বাড়বে, এটাই মৎস্যবিজ্ঞানীদের মত।

ইলিশ নদীর যত গভীরে যায়, তত খাবার খাওয়া কমিয়ে দেয়। তখন সে তার শরীরে জমে থাকা ফ্যাট থেকে শক্তি সংগ্রহ করে। ফলে শরীরে চর্বির পরিমাণ কমতে থাকে। আর ইলিশ নরম এবং সুস্বাদু হয়ে ওঠে। এ ছাড়াও মাছের শরীরে কিছু ফ্যাটি অ্যাসিডের জন্ম হয় ও তার নানা রূপান্তর ঘটে। এর ফলেও বাড়ে ইলিশের স্বাদ ও গন্ধ। বাঙালি দাম্পত্যজীবনের সঙ্গে ইলিশের মিল খুঁজে পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাঙালির বিয়ের পরবর্তী অবস্থাকে জালে পড়া ইলিশের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তো লিখেইছেন, ইলিশের স্বাদ দেড় কিলো থেকে পৌনে দু’ কিলোয়। তিনি বিশ্বাস করতেন, ‘দুধের স্বাদ যেমন ঘোলে মেটে না, তেমনই খাঁটি ইলিশের স্বাদের সঙ্গে অন্য কোনও কিছুর সমঝোতা চলে না’ । আবার কবি নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী লিখেছিলেন, ‘সপ্তমী পুজোর দিনে আমি সওয়া দেড় কেজি ওজনের এমন একটা সুলক্ষণ ইলিশ মাছ কিনব, যার পেটে সদ্য ডিমের ছড় পড়েছে।’

সুলক্ষণ বলতে তিনি সেই ধরনের ইলিশের কথা বলেছেন, যার চেহারা একটু গোলাকার, পেট সরু এবং মাথাটা আকারে ছোটখাটো। ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র একত্রিশটি মাছের উল্লেখ করেছিলেন, যার শেষেরটি ইলিশ। হুমায়ুন আহমেদ মনে করতেন, বাংলা বর্ণমালার শিশুশিক্ষার বইয়ে ‘আ’ -তে যদি আম হয়, তা হলে ‘ই’ -তে ইলিশ।

পদ্মার অরিজিনাল ইলিশ বোঝার উপায় ইলিশের নাক ভাঙা দেখে। ইলিশ যখন পদ্মায় ঢোকে, হার্ডিন ব্রিজের স্প্যানে ধাক্কা খায়। আর তাতেই ইলিশের নাক থেঁতো হয়ে যায়। সেই সব নাকভাঙা ইলিশই আসল পদ্মার ইলিশ।

এই কথাগুলো পড়তে যে সময় লাগে, সেই সময়টুকুতেই ইলিশরা মিঠে জলে ১৫ থেকে ১৮ লাখ ডিম পাড়ল।

ডিম ফুটে ছয় থেকে দশ সপ্তাহের মধ্যে বাচ্চারা ১২ থেকে ২০ সেন্টিমিটার পর্যন্ত লম্বা হয়ে গেল। এর পর খোকা ইলিশ পাঁচ থেকে ছ’ মাস নদীতে কাটিয়ে শুরু করল তার ক্যাটাড্রোমাস পরিযাণ। মানে মিষ্টি জল থেকে ফিরে গেল ভাটির টানে, সাগর পানে। বড় হয়ে ফের শীতে আসবে বলে।

লেখা ৪

চলে গেলেন ডেরেক ম্যালকম

চণ্ডী মুখোপাধ্যায়

একটা সময় ছিল যখন প্রতি বছর দেখা হত। ভারত ফিল্ম ফেস্টিভাল তখন ঘুরে ঘুরে। নব্বই-দশক। কখনও দিল্লি,পরের বছর মাদ্রাজ তার পরের বছর কলকাতা বা হায়দরাবাদ এই রকম। সেখানে দেখা হত; হত সিনেমা নিয়ে নানা আড্ডা। ঋত্বিক ঘটকের ভক্ত ছিল এই ডেরেক ম্যালকম। ঋত্বিককে আন্তর্জার্তিক স্তরে নিয়ে যাওয়ার পেছনে তার অবদান অনেকটাই। ব্রিটিশ চলচ্চিত্র সমালোচক। প্রবাদপ্রতিম। যুক্ত ছিলেন গার্ডিয়ান পত্রিকার সঙ্গে। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেও এসেছিল কলকাতায়। দিল্লিতেও বোধহয়। আমার ছেলে সোমক বিদেশ থেকে খবর দিল। ডেরেক মারা গেছে। বন্ধু-মৃত্যুর শোক পেলাম।

আজ বিশ্ব সিনেমার শোকের দিন। আজ স্মৃতিতে আমি আর ডেরেক। শুধু গার্ডিয়ান নয় পৃথিবীর সব সেরা সিনেমা পত্রিকাতেই লিখেছেন তিনি। ভারতীয় সিনেমার ওপর তাঁর আলাদা এক দখল ছিল। ঋত্বিকের ছবির প্রতি ছিল তাঁর এক অমোঘ টান। আন্তর্জাতিক স্তরে ঋত্বিককে নিয়ে অনেক লেখাই লিখেছেন তিনি। সিনেমা নিয়ে নিয়মত কলম লিখতেন প্রায় ৩০বছর। ১৯৩২ সালে জন্ম।২০২৩-এ ৯১ বছর বয়সে মারা গেলেন ডেরেক।

অজানার উজানে (প্রথম ভাগ)

বাবলু সাহা

এই বাংলার আনাচে কানাচে রয়েছে রোমাঞ্চকর অ্যাডভেঞ্চারের জন্য দারুন দারুন সব জায়গা। এরকমই একটি জায়গার রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা নিয়ে শুরু হল নতুন ধারাবাহিক···

মাঝে মাঝে মনে হয় আমি কি অ্যাডভেঞ্চার খুঁজি, না সে-ই আমাকে যেখানেই থাকি না কেন ঠিক খুঁজে নেয় ! নইলে বারবার কেন আগাম কোনো পরিকল্পনা ছাড়াই আমার জীবনে আচমকা এসব ঘটে যায় ! সেই রকমই একটি ঘটনার কথা বলব বলেই এবার কলম ধরা !

সেটা ছিল ১৪ নভেম্বর। ঘাটনাচক্রে আমার জন্মদিন।দু তিনদিন আগে ঠিক হয়েছিল ১৩ নভেম্বর হাওড়ার নিউ প্ল্যাটফর্ম থেকে রাত সাড়ে দশটার আদ্রা-চক্রধরপুর সুপার ফাস্ট ধরে পরদিন সকালে বলরামপুর পৌঁছতে হবে। আমি তখন বেহালার প্রকৃতি পরিব্রাজক সমিতির সঙ্গে যুক্ত।ওই ক্লাব প্রত্যেক বছর শীত কালে বাচ্চাদের মাউন্টেনিয়ারিং আর প্রকৃতি পাঠের শিক্ষা দেয়। এ জন্যে তাদের নিয়ে যাওয়া হয় কোনোবার পুরুলিয়া আবার কোনো বছর দার্জিলিং বা ওই রকম কোনো জায়গায়।

সেবার মনে আছে এই ক্যাম্পের জায়গা যেখানে ঠিক হয়েছিল একদিন দেরি হওয়ায় সেটা অন্য ক্লাবের হাতে চলে যায়। অগত্যা তড়িঘড়ি নতুন জায়গা নির্বাচন করে সব ব্যবস্থা করতে হবে। ফলে নতুন জায়গার সন্ধানে পুরুলিয়া রওনা দেওয়া। সঙ্গী ছিলেন সমিতির কর্ণধার হরপ্রসাদ চট্টখন্ডি ওরফে চট্টোদা। বেচারা ভাঙা কোমরের কারণে ধীরে একটু খুঁড়িয়ে চলেন। নয়ত খুবই উৎসাহী মানুষ।

যাই হোক, খুব ভোরে ট্রেন থেকে তো নামা হল। এবার ফ্রেশ হয়ে নিয়ে সামান্য কিছু ব্রেকফাস্ট সেরে বেরিয়ে পড়া দরকার। পূর্ব পরিচিত , বলবামপুরেরই ছেলে সোনু তার মারুতি ভ্যান নিয়ে হাজির। সব শুনে সে-ই প্রস্তাব দিল একটা সম্পূর্ণ নতুন জায়গায় নিয়ে যাবার। শুনে বুঝলাম জায়গাটা সত্যিই একেবারে নতুন তো বটেই এর আগে ওখানে ক্যাম্প তো দূরস্থান সেইভাবে কেউ এখনো নামই শোনেনি জায়গাটার।

বলরামপুর বাজার ছাড়িয়ে বাঁ দিকে যে রাস্তাটা সোজা চলে গেছে আমরা যাব সেই পথেই। ওই রাস্তায় একেবারে শেষ যে গ্রাম সেটি ছাড়িয়ে আরো খানিকটা গেলে কানাবুরু পাহাড়। ঘন গভীর জঙ্গল । তখনও সে জঙ্গলে বন দপ্তরের কাজ খুব একটা হয় তো নি-ই সেই সঙ্গে পাশের পাহাড় দুটি প্র্যাকটিসের পক্ষেও একদম আদর্শ বলতে যা বোঝায় তা-ই।

যাই হোক, নিচে দেখলাম বেশ খানিকটা ফাঁকা সমতল জায়গা। ভালোই হল, চট্টোদাকে গাড়িতে বসিয়ে রেখে যাওয়া যাক। দেখেশুনে ফিরে আসা যাবে তাড়াতাড়িই। সেই মতো প্ল্যানে চটপট সেই কানাবুরু পাহাড়ে উঠতে শুরু করা গেল। তখন কী আর জানতাম ওপরের একেবারে সর্বোচ্চ যে পয়েন্ট সেখান থাকে নামবার সময়ে আমাদের জন্যে কী বিপদ অপেক্ষা করছে !

এখানে বলে রাখি আমি আর সোনু কানাবুরু (স্থানীয় ভাষায় বুরু মানে পাহাড়) নামে যে পাহাড়ে উঠেছিলাম সেই ঘন জঙ্গলে ভরা পাহাড়ে একমাত্র স্থানীয় বনদপ্তরের কর্মীরা আর এলাকার দু চারজন ছাগল চরাতে ছাড়া কেউ সচরাচর পা দেয় না।

পাহাড়ের নিচে কিছুটা জায়গা জুড়ে চাষবাস হয়।আশেপাশে কয়েকটা পুকুর বা তালাও আর অল্প গভীর জলের একটি সরু আর ছোট নদী আছে।

আমরা দুজন নিচে রাখা গাড়িতে চট্টোদাকে বসিয়ে পাহাড়ে ওঠার বেশ জঙ্গলাকীর্ণ সরু একটা খাড়াই রাস্তা ধরে সোজা একেবারে ওপরে এসে কিছুটা বিপজ্জনকই একটি ঢালের ওপরে দাঁড়িয়ে বেশ কিছুক্ষণ নিচের অপরূপ একেবারে যাকে বলে ছবির মতো দূরের ছোট গ্রাম আর পুরুলিয়ার বিখ্যাত অযোধ্যা পাহাড়ের ঠিক পেছনের দৃশ্য (যা এখানকার কোনো পাহাড় থেকেই দেখা যায় না) মুগ্ধ হয়ে দেখতে থাকি এবং কিছু ছবি ক্যামেরাবন্দি করি। তখন ঘড়িতে ঠিক এগারোটা। এরপর নিচে নামার পালা।

দ্বিতীয় ভাগ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

লেখা ৬

সুমেরুতে সাতদিন (তৃতীয় ভাগ)

রাজর্ষি পাল

পেশায় চিকিৎসক রাজর্ষি পাল থাকেন ইংল্যান্ডে। একটি বিশেষ মেডিক্যাল ট্রেনিং - এ গিয়েছিলেন সুমেরু অভিযানে। ফিরে এসে লেখা সেই অভিযানের বিবরণ নিয়ে বাংলা স্ট্রিট-এ চলছে একটি ধারাবাহিক। তৃতীয় অংশ রইলো এই সংখ্যায়...

১৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৩

আজ সকালে প্রাতরাশের পর কাঠের বড় হলঘরে হল আরেকপ্রস্থ লেকচার – মেরু অভিযানের জন্য কি কি জিনিসপত্রের প্রয়োজন, বিশেষত চিকিৎসার জন্য কি কি সরঞ্জামের প্রয়োজন, হল তার ওপর ছোট খাটো লেকচার।

আজ আমাদের যাত্রা অন্য দিকে। কুকুরে টানা স্লেজ গাড়িতে করে পারি দেব উষর-শীতল মেরু রাজ্যে। বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এই কুকুর গুলিকে বলে হাস্কি ডগ। অতি শীতল আবহাওয়ায় এরা বেঁচে থাকতে পারে। জন্মের পর থেকেই শুরু হয়ে যায় এদের প্রশিক্ষণ। অত্যন্ত ভালবাসা দিয়ে তিল তিল করে এদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়।

ছোট একটা মিনিবাসে করে যেতে হবে হাস্কি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। দীর্ঘক্ষণের যাত্রা। শুভ্রতায় মোড়া রাস্তা এবং দুপাশের পরিবেশ। বরফে ঢাকা পাইন-গাছের জঙ্গল-নদী-পর্বত-অরণ্যানী। শুরুতেই বিপত্তি। বেশ কিছুটা যাওয়ার পর আমাদের গাড়ি গেল বিগড়ে। এক্কেবারে নট নরন-চরন। গাড়ি থেকে নেমে বনেট খুলে অনেক কসরত করা হল। কিন্তু গাড়ি চলবার নামগন্ধ দেখা গেল না। সে এক মহা বিচ্ছিরি অবস্থা। বরফে ঢাকা পর্বত আর অরন্যের মাঝখানে তুষারে ঢাকা রাস্তার ওপর আমরা হতভম্ব হয়ে দাড়িয়ে। সাথে অকেজো এক গাড়ি। অয়ারলেসে খবর পাঠিয়েও কোন সুরাহা হল না। শেষ অবধি পিঠে রুক স্যাক নিয়ে বরফের ওপর দিয়ে হাটাই সব্যাস্ত হল। যদিও কষ্টকর ব্যাপার। তবু দুপাশের দৃশ্য দেখে অজান্তেই মনটা ভরে গেল। তুষারে ঢাকা পাইন গাছের জঙ্গল, তার ওপারে তুষারাবৃত নদী, তার ওপারে তুষারাবৃত পর্বত, মেরুপ্রদেশের আবছায়া আলো-আধারি-অন্ধকার – এ যেন এক রপকথার জগত।

ঘন্টা খানেক এই বরফ-আলো-আধারির রূপকথার দেশের মধ্য দিয়ে হেঁটে পঊছালাম হাস্কি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। তুষারে মোড়া নিবিড় এক পাইন গাছের জঙ্গলের ধারে এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্র। ছড়ানো ছেটান কাঠের বাংলো, এদিক ওদিকে কাঠের তৈরি স্লেজ গাড়ি আর তার দিয়ে ঘেরা কুকুরদের আবাসস্থল। কুকুরদের প্রশিক্ষকের নাম ত্রিনা, যেন বাঙালি নাম, আদতে নরডিক। কুকুরগুলি অতীব সভ্য এবং প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত – যেন মানব সন্তান। অত্যন্ত যত্ন করে তিলে তিলে এদের বড় করে তোলা হয়। অত্যন্ত কষ্ট সহিষ্ণু, ঘন্টার পর ঘন্টা বরফের ওপর দিয়ে স্লেজ গাড়ি টেনে নিয়ে চলতে পারে।

ইতিমধ্যে শুরু হয়ে গেছে তুষার পাত। কুকুরগুলিকে আমাদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হল। একেকজনের ভাগ্যে চারটে করে কুকুর আর একটা করে স্লেজ গাড়ি। কিভাবে স্লেজ চালাতে হয় তার ওপর লেকচার হল। কিভাবে সঙ্কেত দিয়ে কুকুরগুলিকে চালাতে হয় বা কি ধরনের সাবধানতা অবলম্বন করতে হয়, হল তার ওপর প্রশিক্ষণ। এর পর শুরু হল স্লেজ গাড়ি সহ যাত্রা। দুপাশের পাইন গাছের জঙ্গল ভেদ করে বরফের আস্তরনের ওপর দিয়ে ছুটে চলল হাস্কি বাহিনী; টেনে নিয়ে চলল স্লেজ গাড়ি। এক একটা গাড়িতে একজন সওয়ারি, টেনে নিয়ে চলেছে চারটে কুকুর। বলতে লজ্জা নেই, দুবার আছাড় খেয়ে পোক্ত হলাম আমি। পাইন গাছের জঙ্গল ছাড়িয়ে ঊষড় মেরু উপত্যকা। দুপাশে দিগন্ত বিস্তৃত তুষার শুভ্র ভূমি, জমে যাওয়া হ্রদ এবং নদী, তার

ওপারে তুষার শুভ্র পর্বত – আলো আধারির আবছায়ায় এক স্বপ্নের মধ্য দিয়ে যেন এগিয়ে চলা।

দিগন্ত বিস্তৃত জন-মানবহীন এই শুভ্র মেরু-প্রদেশে একটা চক্কর দিয়ে আবার ফিরে আসা হাস্কি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে। কাছাকাছি এসে পাইন গাছের জঙ্গলের মধ্যে থামলাম আমরা। হাস্কিদের বিশ্রামের প্রয়োজন, আমাদেরও। জঙ্গলের পারে এক জমে যাওয়া নদীর ওপারে তিনটি বল্গা হরিণ দেখা দিয়েই মিলিয়ে গেল ওপারের জঙ্গলের মধ্যে।

স্লেজ গাড়ি থেকে কুকুরগুলিকে মুক্ত করে দেওয়া হল। গলার চেন বেঁধে দেওয়া হল আশে পাশের গাছগুলির সাথে। ত্রিনা এসে প্রতিটা কুকুরের থাবা পরীক্ষা করে দেখল আঘাতের চিহ্ন আছে কিনা। এবার কুকুরগুলিকে খাওয়ানোর পালা। আমরা নিজেরা যদিও অভুক্ত, তবু নিয়ম হল আগে খাওয়াতে হবে হাস্কি বাহিনীকে, এতটাই ভালবাসা মনুষ্যেতর অবলা জীবদের প্রতি। এবার বরফের ওপর বিছিয়ে দেওয়া হল বল্গা হরিণের ছাল। তার ওপর বসে সাঙ্গ হল আমাদের মধ্যাহ্ন ভোজ – প্যাকেটের এবং টিনের খাবার।

এরপর আবার যাত্রা শুরু হল। হাস্কিদের আবার বেঁধে দেওয়া হল স্লেজের সাথে। পাইন গাছের জঙ্গল ভেদ করে বরফের ওপর দিয়ে অন্য দিকে ছুটে চলল হাস্কি বাহিনী। জমে যাওয়া অরন্য – হ্রদ – পর্বত – উপত্যকা পেরিয়ে স্বপ্ন রাজ্যের মধ্য দিয়ে ঘুরে ঘন্টা দুয়েক বাদে আবার ফিরে আসা হাস্কি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

তুষারপাত শুরু হয়ে গেছে আবার, আরও ঘন হয়ে। গোধূলির আলো – আধারির খেলা মিলিয়ে যেতে শুরু করেছে, নেমে আসছে মেরু-প্রদেশের হিমশীতল অন্ধকার রাত। হাস্কিদের শেষবারের মতন আদর করে ত্রিনা এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের অন্যদের বিদায় জানিয়ে গিয়ে উঠলাম আমাদের মিনিবাসে। - হ্যাঁ , বাস সারিয়ে তা পৌঁছে গিয়েছিল হাস্কি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে।

আগের রাত এবং আজকের রাত – দুরাতেই হল অসাধারণ অভিজ্ঞতা – অ্যারোরা বোরিয়ালিস বা Northern light। কাঠের হলঘরে ডাক্তারি লেকচারের পর ডিনার, তারপর কান ঢাকা পুরু জ্যাকেট, ট্রাউউসার এবং গাম বুট পরে বাইরে এসে দাঁড়ালাম। তুষারপাত থেমে গেছে। তাপমাত্রা হিমাঙ্কের চল্লিশ দিগ্রী নীচে। অন্ধকার হিমশীতল আকাশের দিকে মাথা তুলে তাকিয়ে আমরা। হঠাৎ ঘুটঘুটে অন্ধকার

আকাশের একপ্রান্ত থেকে অন্য় প্রান্তে এক ইলেকট্রিক কারেন্টের মতন চলে গেল এক নীল বর্ণের আলোর ছটা, তারপর ধীরে ধীরে সাপের মতন ঘুরতে লাগলো গোটা আকাশ জুড়ে – বদলাতে লাগলো রঙ – কখনো হল সবুজ কখনো বা গোলাপি। স্তব্ধ হয়ে আমরা দেখতে লাগলাম বিশ্ব – ব্রহ্মাণ্ডের এই মহাজাগতিক রোশনাই।

হঠাৎ করে মিলিয়ে গেল এই আলো। আবার সব অন্ধকার। আবার আকাশের অন্য প্রান্তে জেগে উঠল আলোর বিস্ফুরণ, আবার গোটা আকাশ জুড়ে ঘুরপাক খেতে লাগলো মায়াময় আলোর দ্যুতি।

১৪ ফেব্রুয়ারী ২০১৩

আজ স্কি এর ট্রেনিং। সকাল হতেই তোড়জোড়। স্কি এর জিনিসপত্র নিয়ে বরফে ঢাকা লেকের ওপর এসে দাঁড়ালাম। সত্যি বলতে কি এদিনটা আমার জন্য ঠিক উপযুক্ত ছিল না। স্কি করতে গিয়ে বার কয়েক আছার খেয়েছি। পায়ে স্কি ফ্রেম বেঁধে হাতে স্কি পোল নিয়ে প্রথমে ওয়ার্ম আপ, তারপর বরফের ওপর পেছল খেয়ে এগিয়ে চলার কসরত। বরফে ঢাকা পাহাড়ে উঠে স্কি করে নেমে আসা, যাকে বোলে আল্পাইন স্টাইল, আল্পস পর্বতের নামানুসারে। অথবা সমতল ভূমির ওপর দিয়ে স্কি করে এগিয়ে যাওয়া, যাকে বলে cross country ski.

ক্রস কান্ট্রি স্কি করে অনেকটা চলে এসেছি। আবহাওয়া খারাপ হয়ে তুষার ঝরের পূর্বাভাস দেখা দিল। প্রচণ্ড বেগে বইতে শুরু করল বাতাস। বরফের মধ্যে গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে পা ঝুলিয়ে সারি দিয়ে বসে মাথার ওপর মেলে দেওয়া হল শক্ত পোক্ত এক তাঁবু। আমাদের চারপাশ ঢেকে তাঁবুর নীচের দিকটা গর্তের মধ্যে ঢুকিয়ে তার ওপর আমরা গোল হয়ে বসলাম। ঝরের হাত থেকে

রক্ষা পাওয়ার আমোঘ ব্যাবস্থা। আমাদের শরীরের উত্তাপ তাঁবুর মধ্যে আটকে পরস্পরকে সজীব আর উষ্ণ রাখবে।

এই অবস্থায় হাসিঠাট্টা আর গল্প-গুজব করে সাঙ্গ হল প্যাকেটের আনা দুপুরের খানা। প্রায় ঘন্টা-খানেক পর বাতাসের প্রকোপ কিছুটা কমলে আমরা বেরলাম তাঁবুর আরাম থেকে। গুটিয়ে ফেলা হল তাঁবু। বাতাসের প্রকোপ কমলেও তখনো আবহাওয়া সঙ্গিন। আকাশ যেন নেমে এসেছে পৃথিবীতে। তুষার পাতের মধ্য দিয়ে স্কি করে এগিয়ে চলার পালা। স্কি করে বরফে ঢাকা লেক পেরিয়ে, জমে যাওয়া পাহাড় এবং অরণ্যানী পেরিয়ে এগিয়ে চললাম। অত্যন্ত কষ্টকর ব্যাপার। জীবনে এই প্রথমবার এতক্ষন স্কি করার অভিজ্ঞতা। বরফে ঢাকা অরণ্যানী পেরিয়ে আবার ফিরে চলার পালা বেস ক্যাম্পের দিকে।

ক্যাম্পে ফিরে বেশীক্ষণ আরাম সইল না। আজ রাতে বেস ক্যাম্পের আরাম ছেরে তুষার পাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে হবে দূরের পথে। অন্ধকার রাত, তুষারপাত আর মাইনাস চল্লিশ ডিগ্রির হিমাঙ্ক হবে আমাদের সঙ্গী। পরের রাতগুল কাটবে বরফের মধ্যে তাঁবুর ওপর অথবা বরফের গুহায়।

বেস ক্যাম্পে ফিরে শুরু হয়ে গেল তোড়জোড়। কোনমতে খেয়ে রুক স্যাক গুছিয়ে বাইরে এলাম। বেশিরভাগই স্কি করে তুষারপাতের মধ্য দিয়ে অন্ধকার রাতে এগিয়ে যাবে। বেন কুপার, আমি আর কয়েকজন স্নো স্কুটারে চেপে আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র নিয়ে দ্রুত এগিয়ে যাবো অগ্রবর্তী দল হিসাবে। আমাদের যাত্রা স্থলের নাম ক্যাম্প গামা।

ঘুটঘুটে রাতে স্নো স্কুটারে চেপে আমরা কয়েকজন তুষার পাতের মধ্য দিয়ে এগিয়ে চললাম। স্নো স্কুটারের পেছনে বাঁধা বিশাল চেহারার স্লেজে ত্রেপল দিয়ে বাঁধা ক্যাম্পের আনুসঙ্গিক জিনিসপত্র। অপেক্ষাকৃত কম গতিতে বরফে ঢাকা প্রান্তরের ওপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে চলতে লাগলো স্নো স্কুটার এবং পেছনে বাঁধা স্লেজ।

প্রায় ঘন্টা খানেক এইভাবে চলার পর পউছালাম নির্দিষ্ট জায়গাতে। আমাদের আগে নূট এবং আর কিছু কর্মচারী এসে কয়েকটা এস্কিম টেন্ট বরফের ওপর খাটিয়ে দিয়ে গেছে। আমরা পৌঁছে যতটা সম্ভব দ্রুত গতিতে অন্ধকার এবং তুষার পাতের মধ্যে টর্চের আলোয় টেন্ট গুলো গুছিয়ে নিলাম। অন্ধকারের মধ্যে যতটা সম্ভব বোঝা গেল

বরফে ঢাকা উঁচু নিচু পাহাড়ে ঘেরা এক উপত্যকার মধ্যে অবস্থান ক্যাম্প গামার। আরও প্রায় ঘন্টা দুয়েক পরে অন্ধকার এবং তুষার পাতের মধ্যে যেন দেখা গেল আলোর ঝলক। প্রথমে একটা দুটো, তারপর আরও কয়েকটা, তারপর আরও আরও অনেক। তারপর অন্ধকার শীতল দিগন্ত পূর্ণ হয়ে উঠল আলোর ঝলকানিতে – অন্ধকারে তুষার পাতের মধ্য দিয়ে হেড টরচের আলোয় উঁচু নিচু তুষার প্রান্তরের মধ্য দিয়ে স্কি করে এগিয়ে আসছে অভিযাত্রীরা।

একে এক এসে পৌছাতে লাগলো তারা। অন্ধকার অচেনা তুষার প্রান্তরের ওপর দিয়ে স্কি করে আসা অত্যন্ত পরিশ্রমের কাজ। অনেকেই বেশ কয়েকবার আছার খেয়েছে। এই মাইনাস চল্লিশেও প্রত্যেকেই গলদঘর্ম এবং অতীব পরিশ্রান্ত। তাঁবুগুলোর মধ্যে ঢুকে গুছিয়ে বসতে সময় লাগলো। এক একটা তাঁবুতে সাত-আটজন করে – বেশ গাদাগাদি অবস্থা। তাঁবু গুলোর ঠিক মাঝখানে একটা করে কেরোসিনের হিটার। তার চারপাশে স্লিপিং ম্যাট্রেস বিছিয়ে আগামী কয়েক দিনের সংসার।

অ্যাডী এবং কেরি এসে দেখে গেলেন সবাই গুছিয়ে বসেছে কিনা। সেই রাতে বিশেষ কিছু আর নয়, প্রত্যেকেই পরিশ্রান্ত।

চতুর্থ ভাগ আগামী সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

লেখা ৭

বাঙালির অ্যালেন

কিঞ্জল রায়চৌধুরী

ভোজনপ্রিয় বাঙালির রসনায় কবিরাজি-কাটলেট বরাবরই তালিকার উপরদিকেই। ইদানীং যোগ হয়েছে চাইনিজ, বিশেষত নব্য প্রজন্মের কাছে। আর এই রসনার রাসমেলায় যে-কটি রেস্তোরাঁ সার্ভিংয়ে সিদ্ধহস্ত – তাদেরই মধ্যে অন্যতম 'অ্যালেন কিচেন' । যদিও কলকাতার ডাকসাইটে ভোজন-রসিকদের কাছে অ্যালেন কিচেনের নাম নতুন করে চেনাবার নেই। স্বনামে চিহ্নিত রেস্তোরাঁটি বরাবর বিখ্যাত বিশেষ করে প্রন কাটলেটের জন্য। এটাকে স্পেশ্যালিটি বলা যায়। খাদ্য সংস্কৃতির পীঠস্থানে দেড়শো বছরের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে অ্যালেন।

১৮৮৪ সালে জীবনকৃষ্ণ সাহার প্রতিষ্ঠিত অ্যালেন-এর সুখ্যাতি তাদের রান্নার সুবাসের সঙ্গে সঙ্গেই ছড়িয়ে পড়ে সারা কলকাতায়। সেটা এমনই যে, কলকাতা শহর জুড়ে তারা একসময়ে গড়ে তোলেন একটি-দুটি নয় পাঁচ পাঁচখানা আউটলেট । এখন সংখ্যা কমে এলেও উত্তর কলকাতার শোভাবাজারের 'অ্যালেন কিচেন' তাদের তৈরি কবিরাজি, ব্রেস্ট কাটলেট ও নানাস্বাদের রকমারি সম্ভার নিয়ে এখনও উজ্জ্বল। তেমনই দক্ষিণ কলকাতার হাজরাতেও নিজের পরিচিতি সগৌরবে জানান দিচ্ছে 'অ্যালেন' – 'Allen kitchen seveurs de Calcutta'।

অ্যালেন-এর নামের সাথে জড়িয়ে এক স্কট সাহেব মি.অ্যালেনের নাম। মালিকানা যদিও সাহা পরিবারেরই ছিল, এবং প্রত্যক্ষ ভূমিকাও। এককথায় মহানগরীর উত্তর-দক্ষিণ দুইপ্রান্তের ইন্ডিয়ান, মোগলাই, সি ফুড এবং চিনা খাবারের নির্ভরযোগ্য রান্নাঘর হয়ে উঠেছে, অ্যালেন-এর রান্নাঘর। খাঁটি ঘিয়ে ভাজা ভেটকি ফিলেট বা ফ্রেস চিকেনের ব্রেস্টে তৈরি চিকেন রোল (পরোটায় মোড়া নয়, কোটিংয়ে মোড়ানো মুচমুচে মজাদার) খেতে হলে চির প্রতিষ্ঠিত আদি 'অ্যালেন কিচেনের জুড়ি মেলা ভার।

ওদিকে কালীঘাটের খুব কাছাকাছি প্রিয়নাথ মল্লিক রোড-এ অবস্থিত অ্যালেনের পারদর্শিতা জিভে তুফান তুলছে চাইনিজ় খাবারেও! মেন ডিশে চিকেন নুডলস, এগ নুডলস, মিক্সড় রাইসের সঙ্গে সাইড ডিশে চিকেন হট গারলিক, পনির ও ভেজ মাঞ্চুরিয়ান যেমন পেটচুক্তির আয়োজনে অনবদ্য তেমনি ফিস মাঞ্চুরিয়ান অথবা বাঙালির অতিপ্রিয় চিলি ফিস (প্রকারান্তরে ফিস চিলি)-ও জায়গা নিতে পারে ডিনার-টেবিল জুড়ে। অতি চেনা এইসব খাবারে 'অ্যালেন কিচেন' তাদের অনন্যতা বজায় রাখছেই তাদের নিজস্ব সিক্রেট স্পাইস ও হোমমেড শস ব্যবহারের মাধ্যমে। স্বাদের সঙ্গে স্বাস্থ্যের খেয়াল রাখতেও ভুলছে না ঐতিহ্যবাহী অ্যালেন-এর রান্নাঘর।

চেনা খাবারের পাশাপাশি এবার জানা যাক 'অ্যালেন কিচেন' -এর নিজস্ব কিছু রকমারি খাদ্যসম্ভার সম্পর্কে – যাতে আপনাদের ডিনারের প্রোগ্রাম স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়। সুস্বাদু বাটার রাইসের সহযোগে চিকেন স্টিক অথবা মাটন স্টিকের কম্বো ২১০/- থেকে ২৩০/- টাকায় সাজিয়ে নিয়ে বসলে জমে যাবে ছুটির দিনের রাতের খাবার। কিংবা ধরুন, প্লেটভর্তি মেক্সিকান রাইস, সঙ্গে ট্যাঙ্গি সসের সঙ্গতে তিন পিস

চিকেন/ফিস পাকোড়া সফট ড্রিংকস সমেত ২৫০/- টাকায় মিললে পেট-মন দুই-ই বৃন্দাবন!

এ ছাড়াও ফ্যামিলি কম্বো হিসেবে ২পিস প্রন কাটলেট, ৪ পিস চিকেন পাকোড়া ও ৪ পিস ফিস ফিঙ্গার, গলা ভেজানোর শীতল পানীয়-র সাথে নিয়ে বসলে সন্ধে কাবার সঙ্গীর সাথে, জগৎ রইবে অন্যধারে। কাটলেটের অলটারনেটিভে যদি ফিস কবিরাজি চান, আটকায় কে! আর নরম শীতল পানীয় বলতে কোক-পেপসি নয় – চকলেট মিল্কশেক থেকে শুরু করে গন্ধরাজ মোহিতো... মকটেলে ডুব দেবেন নির্দ্বিধায়। চলে আসুন অ্যালেন-এ।

লেখা ৮

চায়ে সারান রোগব্যাধি

অনীশ রায়

চা তো খাই কমবেশি আমরা প্রত্যেকেই। কিন্তু কজন আর এর বিভিন্ন গুণাগুণ জেনে খাই ! যেমন ধরা যাক এমন কোনো চা কি হয় যা খেলে পেটের সমস্যা মিটে যেতে পারে অনায়াসে ? পারেই তো। বিশষজ্ঞরা বলছেন, যেকোনো পেটের অসুখের সমাধান করতে পারে এমন কিছু চা নাকি রয়েছে হাতের কাছেই। কিংবা এমন চা-ও নাকি রয়েছে বদহজম হোক বা অ্যাসিডিটি কমবে যা খেয়েই। এজকের এই লেখায় এমন কিছু চায়েরই হদিশ রইল। যেমন গোলমরিচের চা-বিশেষজ্ঞদের খবর অনুযায়ী, গোলমরিচ চা পেট সংক্রান্ত অনেক সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। রাতে ঘুমানোর আগে গোলমরিচ চা পান করতে হবে, সকালে পেট সম্পূর্ণ পরিষ্কার হবে। গবেষণায় নাকি দেখা গিয়েছে, গোলমরিচ অন্ত্রকে আরাম দেয় এবং ব্যথা উপশম করে। গবেষণায় আরো দেখা গিয়েছে যে গোল মরিচ ভেষজ যৌগ

রয়েছে যা প্রতিরোধক কোষগুলির সক্রিয়করণকে বাধা দিতে সহায়তা করে। এই কোষগুলো সক্রিয় হওয়ার কারণে পেটের সমস্যা কমে যায়। যেমন ধরা যাক গ্রিন টি। গ্রিন টিয়েরও অনেক উপকারিতা রয়েছে। গ্রিন টি পেট সংক্রান্ত বহু সমস্যার একটি প্রাকৃতিক ওষুধ। গ্রিন টি ডায়রিয়া এবং পাকস্থলীর ইনফেকশনে প্যানেসিয়ার মতো কাজ করে। গ্রিন টি পেটের যন্ত্রণা থেকেও মুক্তি দেয়। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে গ্রিন টি গ্যাস্ট্রো সমস্যায় হাসপাতালে যেতে বাধা দেয়। গ্রিন টি-তে এমন যৌগ রয়েছে যা পেটের আলসার, ব্যথা, গ্যাস এবং বদহজম থেকে মুক্তি দেয়। এবার আসুন লেমন বাম চা-য়ের কথায়। লেমন বাম হল এমন একটি উদ্ভিদ যার পাতা কেটে চা তৈরি করা হয়। এটি পুদিনা পাতার মতো। এর গন্ধ সুগন্ধযুক্ত। লেমন বাম ভেষজ চায়ে আইবারোগাস্ট যৌগ পাওয়া যায় যা পাচনতন্ত্রকে শক্তিশালী করে। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে লেবু বাম চা পেট ব্যথা, কোষ্ঠকাঠিন্য এবং অন্যান্য ধরণের সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়। আরেকটি উপকারী পানীয় হল মৌরির চা। মৌরি বহু রোগ সারাতে উপকারী। এটি কোষ্ঠকাঠিন্য, গ্যাস, ডায়রিয়া ইত্যাদি সমস্যায় ব্যবহৃত হয়। একটি গবেষণায় দেখা গিয়েছে যে মৌরি পাকস্থলীর ই-কোলাই সহ অনেক ধরনের ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলে যা কোষ্ঠকাঠিন্য এবং ডায়রিয়ার সমস্যা থেকে মুক্তি দেয়।

লেখা ৯

টা টা করুন হজমের সমস্যাকে

আকাশ দাশগুপ্ত

হজমের সমস্যায় ভোগেন এমন মানুষের সংখ্যা কম নেই । এই ক্ষেত্রে যেকোনও খাবার খেলেই সমস্যা দেখা দেয়। এই পরিস্থিতিতে এমন কিছু উপাদান সাহায্য করতে পারে যা হজমের সমস্যা কমাতে সাহায্য করতে পারে। বিশেষজ্ঞরা হজমশক্তির ভাল রাখার জন্য ডায়েটে কিছু বিশেষে খাবার রাখার উপদেশ দিয়েছে, আসুন জেনে নেওয়া যাক যে সেই উপাদানগুলি কী কী-

বিভিন্ন ফলে ফাইবার সমৃদ্ধ এবং প্রচুর ভিটামিন এবং খনিজ পাওয়া যায়। এই ফলগুলো হজমশক্তি বাড়াতে সাহায্য করে। এই পরিস্থিতিতে ডায়েটে আপেল, কমলা এবং কলার মতো ফল নিয়মিত খেতে হবে। এগুলি ভিটামিন সি এবং পটাসিয়ামের সর্বোত্তম উৎস যা হজমশক্তিকে বাড়ায়।

ব্রাউন রাইস, কুইনোয়া সহ বিভিন্ন গোটা শস্য হজম ক্ষমতা বাড়াতে সাহায্য করে। গোটা শস্যে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে যা হজমশক্তির উন্নতিতে সাহায্য করে। শরীর ধীরে ধীরে শস্য হজম করে, যা রক্তে শর্করার মাত্রা নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে।

পুষ্টিগুণে ভরপুর সবুজ শাক-সবজি হজমশক্তির বাড়াতেও সহায়ক। নেচার কেমিক্যাল বায়োলজি জার্নালের একটি নিবন্ধ অনুসারে, এই সবজিতে সালফোকুইনোভোস রয়েছে। এটি এমন একটি শর্করা যা পেটে স্বাস্থ্যকর ব্যাকটেরিয়াকে বাড়ায়। যা হজমশক্তি বাড়ায় এবং লিভার সুস্থ রাখে। খোসা ছাড়ানো শাকসবজি হজমশক্তির উন্নতিতে সহায়ক। কারণ এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার থাকে। এতে থাকা ফাইবার শরীর থেকে মল বের করে দিতে অন্ত্রকে উদ্দীপিত করে। এমন অবস্থায় খাবারে এগুলো অন্তর্ভুক্ত করলে পেট পরিষ্কার হয়। অতএব, হজমশক্তি উন্নত করতে, আপনি খাদ্যতালিকায় আলু, মটরশুটি এবং লেবুর মতো শাকসবজি অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

লেখা ১০

ম্যাজিকের মতো সারান সাইনোসাইটিস

অলীক দাশ

ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে নানা ধরনের রোগ চেপে বসে। মাথা ব্যথা, গায়ে ব্যথা, সর্দি বা জ্বর খুব সাধারণ সমস্যা, যা প্রায়ই মানুষকে কাবু করে। কিন্তু বর্ষাকালে সাইনাস সংক্রমণের কারণে সেই সমস্যা বাড়তে পারে। অনেক সময়ই দেখা যায় সংক্রমিতের নাক বন্ধ হয়ে যায়। সাইনাস গ্রন্থি থেকে অতিরিক্ত শ্লেষ্মা উৎপাদিত হলে সাইনোসাইটিস হতে পারে। মাথা ব্যথা, নাসা পথ বন্ধ হয়ে যাওয়ার মতো সমস্যা তৈরি হতে পারে এর ফলে।

হিসেব বলছে, আমাদের দেশে প্রায় ১৩০ মিলিয়ন মানুষ দীর্ঘস্থায়ী সাইনোসাইটিসে ভুগছেন। কিন্তু এই দেশের প্রকৃতিতেই রয়েছে এর সমাধান। আমাদের দেশে সাইনাস সংক্রমণ থেকে মুক্তি পেতে কিছু চমৎকার ঘরোয়া প্রতিকার রয়েছে।

সাইনাসের সংক্রমণে কখনও ভোগেননি এমন মানুষ পাওয়া মুশকিল। এই দীর্ঘকালীন যন্ত্রণা খুব সহজেই সারিয়ে ফেলা যায়। বর্ষাকালে অ্যালার্জি, ভাইরাস বা ব্যাকটেরিয়া

সংক্রমণ এবং সাইনাসের কনজেশন বা সাইনাসের গঠনগত অস্বাভাবিকতার কারণে সমস্যা হতে পারে। এতে সব বয়সের মানুষকে আক্রান্ত হতে পারেন।

অথচ, কিছু খাবার সাইনাসের সমস্যায় কাজ করতে পারে। নাক বন্ধ হয়ে গেলে কিছু কৌশল করা যেতে পারে, তাতেই মিলবে স্বস্তি। সাইনাসের উপশমের জন্য ঐতিহ্যগত ওষুধের কাজ করতে পারে জোয়ান বা জোয়ানের পাতা। বহু শতাব্দী ধরে এটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে। অ্যান্টিমাইক্রোবিয়াল এবং অ্যান্টি-ইনফ্লেমেটরি বৈশিষ্ট্য তো বটেই এতে রয়েছে থাইমলের মতো এসেনশিয়াল অয়েল। নাসারন্ধ্রে থাকা জীবাণু মারতে এবং সাইনাসের উপর চাপ কমাতে সাহায্য করে এটি। কাশি প্রতিরোধ করে শ্বাসকার্য উন্নত করে। ভাজা জোয়ানে খেলে সাইনাসের কনজেশন থেকে মুক্তি পাওয়া যায়।

আবার নাক বন্ধ হয়ে গেলে খুব ভাল কাজে আসে গরম জলের ভাপ নেওয়ার মতো পদ্ধতি। গরম জলে কয়েক ফোঁটা ইউক্যালিপটাস তেল মিশিয়ে দিলে আরও ভাল উপকার পাওয়া যায়। ইউক্যালিপটাস তেলে ইউক্যালিপটল নামক একটি যৌগ থাকে যা স্বস্তি পেতে সাহায্য করে। কাশি উপশম করতে, সহজে শ্বাস নিতে, সাইনাসের প্রদাহ কমাতে, বুক পরিষ্কার করতে, নাক এবং ফুসফুসের ব্যাকটেরিয়া মেরে ফেলতে সাহায্য করে এই তেল। হাঁপানির মতো শ্বাসযন্ত্রের অসুখে খুব ভাল কাজ দেয় এটি।

লেখা ১১

বিরাট রহস্য জলের তলায়

অর্ণব দে

ভারত মহাসাগরের তলদেশে নাকি রয়েছে এক সুবিশাল গর্ত। যার বিস্তৃতি প্রায় ৩০ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে। আর এটাই এখন রহস্যের উদ্রেক করছে। বিজ্ঞানীদের মনে জাগছে অপরিসীম কৌতূহল --- বিষয়টা ঠিক কী !

একদল বিজ্ঞানীর বক্তব্য হল, মহাসাগরের তলদেশে বিশাল এলাকা জুড়ে তৈরি হওয়া এই গর্তটি আসলে গ্র্যাভিটি হোল অর্থাৎ মাধ্যাকর্ষণজাত গর্ত। যেখানে পৃথিবীর অভিকর্ষ বল অস্বাভাবিক রকম দুর্বল। আর সবথেকে বড় কথা হল, এর জেরেই যত দিন যাচ্ছে বসে যাচ্ছে সমুদ্রতল। আর সেই সঙ্গে এটা বিশ্বের অন্যতম রহস্যজনক স্থানের তালিকায় জায়গা করে নিচ্ছে।

বর্তমানে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ সায়েন্সের কয়েকজন বিজ্ঞানী এই সংক্রান্ত একটি তত্ব উপস্থাপন করেছেন, যা এই রহস্যময় বিষয়টির উপর আলোকপাত করেছে বলে মনে করা হচ্ছে। তাঁদের দাবি, পৃথিবীর ভূত্বকের নিচে প্রায় ১০০০ কিলোমিটার (প্রায় ৬২১ মাইল) জুড়ে একটি অত্যন্ত শীতল এবং গভীর এলাকা রয়েছে। এটা আসলে প্রাচীন মহাসাগরের অবশিষ্টাংশ। যা প্রায় ৩ কোটি বছর আগে আফ্রিকার নীচে আটকে রয়েছে। এই গোটা প্রক্রিয়ার জেরে রাশি রাশি গলিত শিলা উত্থিত হয়। যার ফলে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে অগ্ন্যুৎপাতের পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে।

এই জটিল ধাঁধার সমাধানে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা চালিয়েছেন। বিগত ১৪০ মিলিয়ন বছর ধরে কীভাবে পৃথিবীর টেকটনিক প্লেট চলাচল করে চলেছে, এই বিষয় নিয়েই মূলত ছিল তাঁদের গবেষণা। তাঁরা কিছু সিম্যুলেশন চালান এবং সেগুলোকে জলের নিচের গর্তের সঙ্গে তুলনা করেন। যাকে আমরা গ্র্যাভিটি হোল বলি। সেই সব সিম্যুলেশনের সঙ্গে ভারত মহাসাগরের গ্র্যাভিটি হোলের মিল পাওয়া গিয়েছে। উভয় ক্ষেত্রেই একটা বিষয় সাধারণ ছিল। আর সেটা হল প্রচুর পরিমাণ গরম ম্যাগমা এবং ম্যান্টল স্তরের নিচে থাকা একটি বিশেষ গঠন।

গবেষকদের মতে, গন্ডোয়ানা থেকে ভারতীয় প্লেট ভেঙে যাওয়ার পর তার সংঘর্ষ হয় ইউরেশিয়ান প্লেটের সঙ্গে। যার ফলে এটি টেথিস প্লেটের উপর দিয়ে চলে যায়। যেহেতু বর্তমান কালের পূর্ব আফ্রিকার কাছে এর ম্যান্টল রয়েছে, ফলে প্রাচীন টেথিস মহাসাগরের টুকরো টুকরো অংশগুলি ধীরে ধীরে ম্যান্টলের নিচের দিকে ডুবে যেতে থাকে। শেষে ২০ মিলিয়ন বছর আগে প্লিউম তৈরি করার জন্য ম্যাগমাকে স্থানচ্যুত করে ডুবন্ত টেথিয়ান প্লেট।

লেখা ১২

হাতের মুঠোয় বিদেশে ডাক্তারি পড়তে যাবার সুযোগ

সুদীপ্ত মুখোপাধ্যায়

ডাক্তারি পড়তে চান , এবং তাও কোথায়, না বিদেশে ? হ্যাঁ , স্বপ্ন বা কল্পনা নয় আর, সেই সুযোগ নিয়েই ও সি কনসালট্যান্টসের ব্যবস্থাপনায় এসে গেল মধ্য এশিয়ার শীর্ষস্থানীয় মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় এস এম ইউ বা সেমেই মেডিক্যাল ইউনিভারসিটি। হু আর এনএমসি স্বীকৃত ইংরেজি ভাষায় পাঁচ বছরের এই এমবিবিএস পড়ার সুবর্ণ সুযোগই কেবল নয়, সেই সঙ্গে এক দুই নয় একেবারে ৭০ বছরের বিরাট ঐতিহ্য সম্বলিত এই বিশ্ববিদ্যালয় আপনাকে আরো কোন কোন সুযোগ দিচ্ছে একটু দেখে নেওয়া যাক আসুন। তারা এই সঙ্গে আরো দিচ্ছে এক বছরের ইন্টার্নশিপ সহ তাদের নিজস্ব হাসপাতাল ও ক্লিনিকে অনুশীলনের সুযোগও।

সম্প্রতি ওসি কনসাল্ট্যান্টসের ব্যবস্থাপনায় কলকাতায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন ও অধ্যাপক আলেকজান্দ্রাভা বালাশকেভিচ নাতালিয়া এবং অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক উরাজালিনা নাইল্যা মুরাখানোভনা জানালেন এই স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ভারতীয় চিকিৎসা প্রতিষ্ঠান ও ক্লিনিকগুলির প্রকৌশল, শিক্ষা এবং বৈজ্ঞানিক অংশীদারীত্বের কথাও। জানা গেল ওদের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে পাশ করে বেরোনো ৩৫ হাজার স্নাতকের কথাও যাঁরা এই মুহূর্তে কাজাখস্তান ও ভারত সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাফল্যের সঙ্গে কর্মরত আছেন। জানা গেল দারুণ টিচার-স্টুডেন্ট রেশিও সম্বলিত এই প্রতিষ্ঠান তাদের ফি স্ট্রাকচারও ছাত্র-ছাত্রীদের সাধ্যের মধ্যে রাখার ব্যাপারে খুবই

নজর রাখে। আন্তর্জাতিক মানের কারিকুলামের কারণে এঁদের সংস্থার ডিগ্রি স্বভাবতই সারা পৃথিবীতে সর্বত্র স্বীকৃত বলেই জানালেন ওরা। ফলে, ওঁদের এই কোর্স ভারতীয় ছাত্রছাত্রীদের বিদেশে ডাক্তারি পড়তে যাবার স্বপ্ন সফল করার অন্যতম চাবিকাঠি হয়ে ওঠার ক্ষমতা ধরে বলেই দাবি ওঁদের ।

হাতের মুঠোয় কানাডায় উচ্চশিক্ষার সুযোগ

শোভেন রায়

ও এস এস এস ডি অর্থাৎ অন্টারিও সেকেন্ডারি স্কুলের ডিপ্লোমা কোর্সের পশরা নিয়ে পাঞ্জাবের লুধিয়ানা, চন্ডীগড়ের পর এবার কলকাতাতেও ঘুরে গেলেন কানাডার গ্রোভেভিল কলেজিয়েটের প্রতিনিধিরা। ও সি কনসালট্যান্টসের ব্যবস্থাপনায় এবার থেকে এই কোর্সে যোগ দিতে পারবেন ভারত বাংলাদেশের ছাত্রছাত্রীরাও। এই কোর্সের প্রোগ্রাম কো-অর্ডিনেটর রায়েন লুই উইলিয়াম জানালেন এই উপ মহাদেশের ছাত্রছাত্রীরা এখন চাইলেই এই হাই স্কুল প্রোগ্রামে যোগ দিতে পারবেন। বিশেষ করে যারা আজ স্বপ্ন দেখেন বিদেশে গিয়ে উচ্চ শিক্ষা লাভ করার তাঁদের জন্যে এ এক বিরাট সুযোগ । এই কোর্সে যোগ দিয়ে অনায়াসে ছাত্রছাত্রীরা কেবল উচ্চ শিক্ষাই লাভ করবেন না, এই কোর্সে পাওয়া নম্বরের ভিত্তিতে তারা এমনকি কানাডাতে গিয়ে পরবর্তী স্তরের শিক্ষালাভের ক্ষেত্রেও পেতে পারবেন বিশেষ সহায়তার সুযোগ। আরো জানা গেল কানাডিয়ান এই হাই স্কুল প্রোগ্রামে যোগ দিলে এখানকার প্রাপ্ত নম্বর যদি কেউ ওদেশে গিয়ে পাঠ নিতে চান তাহলে ভিসা পাওয়ার ক্ষেত্রেও হবে বিশেষ সহায়ক। অর্থাৎ বিশ্বায়নের যুগে যত দিন যাচ্ছে এই উপ মহাদেশের যেসব ছাত্রছাত্রী স্বপ্ন দেখতে অভ্যস্ত হয়ে উঠছেন তাদের সেই স্বপ্ন সফল করার পথে যথাযোগ্য সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেবার ক্ষেত্রে ওএসএসডির সিঁড়ির সন্ধান দিয়ে ধন্যবাদার্হ হয়ে উঠছে কলকাতার সল্ট লেকের ও সি কনসাল্ট্যান্টস প্রা লি।

লেখা ১৪

সবুজ-মেরুন আবেগের নাম মোহনবাগান

অলোক দাশ

মোহনবাগানের ঐতিহাসিক জয় আজ ১১২ বছর অতিক্রম করল। কিন্তু আজও প্রত্যেক বাঙালির মনে মোহনবাগানের সেই জয় বারবার নাড়া দিয়ে যায়।

একটু পিছিয়ে যাওয়া যাক আসুন। মাঠ জুড়ে লক্ষাধিক মানুষের ভিড়। বিশ্বের অন্যতম শক্তিশালী ফুটবল দল ইস্ট ইয়র্কশায়ার রাইফেলস-এর সঙ্গে মাঠে খেলতে নামছে অবিভক্ত বাংলার মোহনবাগান একাদশ। মাঠ জুড়ে এতটাই ভিড় যে দর্শকদের খেলার ফলাফল জানানোর জন্য ঘুড়ি উড়িয়ে ফলাফল জানাতে হয়েছিল। প্রথম দিকে ইস্ট ইয়র্কশায়ারই জিতছিল। রাজেন সেনগুপ্ত প্রতিপক্ষের জ্যাকসনকে বাধা দেওয়ায় প্রতিপক্ষ ফ্রি-কিক পায়, মোহনবাগান গোলরক্ষক হীরালাল মুখার্জি সতীর্থ খেলোয়াড়দের প্রত্যেককেই দূরে সরে যেতে বললেন , সকলেই সরে গেলেন , কিন্তু একমাত্র ভূতি সুকুল দাঁড়িয়ে ছিলেন এই আশায় যে , শটটি তিনি হয়তো আটকে দিতে পারবেন । জ্যাকসনের ফ্রি-কিক সুকুলের গায়ে লেগে দিক পরিবর্তন করে বলটি গোলে ঢুকে যায়, ব্রিটিশ সমর্থকরা আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়েন। দ্বিতীয়ার্ধে মোহনবাগান খেলে একেবারে দৈত্যের মতো। ইস্ট ইয়র্কের রক্ষণ ভাগ একা কানু রায়ের আক্রমণকেই প্রতিহত করতে পারছিল না । কানু রায় ও হাবুল সরকারের মধ্যে দারুণ বোঝাপড়া ছিল । তাতে বিপক্ষের ডিফেন্স পর্যদুস্ত হয়ে পড়েছিল । খেলা শেষ হওয়ার দশ মিনিট আগে শিবদাস আচমকা ডান দিকে ছুঁটে গিয়ে লেফট ব্যাককে ডজ করে দুর্দান্ত একটা শট নেন, ইস্টইয়র্কের গোলকিপার ক্রেসি সম্পূর্ণ পরাস্ত হন। প্রথম গোলের ঘুড়ি আকাশে উড়ল মোহনবাগানের নামে। এই সাফল্যে বাঙলি

সমর্থকরা এমনই চিৎকার করেছিলেন, তাঁদের গলা ভেঙে গিয়েছিল খেলা শেষ হওয়ার মাত্র দু' মিনিট আগে । মনমোহন মুখোপাধ্যায় একটি চমৎকার পাস দেন অভিলাষ ঘোষকে, অভিলাষ দু' জন ডিফেন্ডার ও গোলরক্ষককে কাটিয়ে এগিয়ে গেলেন এবং হাঁটতে-হাঁটতে গোলে বল ঠেলে দিলেন। খেলার অন্তিম ফলাফল হয় ২-১। প্রথমবার ইংরেজদের পরাজয় আনন্দে উদ্ভাসিত হয়ে পড়ে সমস্ত দর্শকরা।

সব খেলার সেরা বাঙালির তুমি ফুটবল। এই ফুটবলের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে বাঙালির বহু আবেগ। এবং সেই আবেগের আরেক নাম মোহনবাগানও বটে। সেই আবেগের অন্যতম একটি দিন ২৯ জুলাই, মোহনবাগান দিবস। ১৯১১ সালের এই দিনেই ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ১১ জন দামাল বাঙালি ছেলে অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন ফুটবল খেলায় ইংরেজদের হারানোর। বুট পরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে খালি পায়ে মাঠে খেলতে নামেন ১১ জন বাঙালি তরুণ। লক্ষ্য তাঁদের তখন একটাই, হেস্টিংসের মাথায় ইংরেজদের পতাকা উড়ছে, সেটাকে নামিয়ে দেশের পতাকা তোলা।

১৯১১-র সেই ঐতিহাসিক মোহনবাগান একাদশের অন্যতম একজন ছিলেন হুগলির উত্তরপাড়ার মনমোহন মুখোপাধ্যায়। ইংরেজদের বিরুদ্ধে যে গোলটি অভিলাষ ঘোষ করেছিলেন তার পাস বাড়িয়েছিলেন মনোমোহন মুখোপাধ্যায়। সেই সময় গোটা দেশের লোক তাকিয়ে শুধু ওই ১১ জনের দিকে । বাংলা মায়ের দামাল ছেলেরা ইংরেজদের চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, তাঁদেরকে দমিয়ে রাখা যাবে না। সেই দিন পা দিয়ে গল গল করে রক্ত বেরোচ্ছিল মনমোহন মুখোপাধ্যায়ের। তবুও গোটা মাঠে তাঁরা সেদিন ইংরেজদের পা থেকে চুম্বকের মতো বল কেড়ে নিচ্ছিলেন । ১৯১১-র সেই ঐতিহাসিক জয় আজও প্রতিটি বাঙালির মনে জ্বলজ্বল করছে। স্বর্ণাক্ষরে ভারতের ও ফুটবলের ইতিহাসে লেখা রয়েছে হাবুল, শিবদাস, মনমোহনদের নাম।

যোগাযোগ

ইমেইল

write@banglastreet.online

ফোন (ভারত)

+91 33 4062 1285

ফোন (বাংলাদেশ)

01924935620

ঠিকানা (ভারত)

CE 17, 3rd Cross Road,
Sector 1, Salt Lake, Kolkata,
West Bengal 700064

ঠিকানা (বাংলাদেশ)

House No.27B, 1st Floor,
Road-3 Dhanmondi,
Dhaka 1205

বাংলা স্ট্রিট অনলাইন

আধুনিক বাঙালির ফেভারিট লোকেশন